মোদি সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের নাগরিক বলেই মনে করে না

বৃন্দা কারাত

ভারতে যে বিশাল সংখ্যায় শ্রমিকবাহিনী রয়েছে, সেটা অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ে আমরা অতি উচ্চমাত্রায় প্রযুক্তিনির্ভর হতে পেরেছি, কিন্তু কঠোর বাস্তব হল এই যে, এই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে সরকারের কাছে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তালাবন্দির অভিজ্ঞতা আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে কীভাবে এই বিশাল সংখ্যক শ্রমিককে যথাযথ নিবন্ধীকরণ করা যায়। পাশাপাশি কীভাবে তাঁদের কর্মনিযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং ভারতের নাগরিক হিসাবে অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানে আরো কঠোর আইন প্রণয়ন করা যায়। এই দিশায় প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার এইসব শ্রমিকদের মর্যাদা সহকারে ঘরে ফিরিয়ে আনা সুনিশ্চিত করুক।

করোনা ভাইরাস সংকট ঘনীভূত হওয়ার মুহূর্তেই ভারত অতিদ্রুত পদক্ষেপ করে বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানে করে ঐ সব ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। গত ৪ মার্চ তারিখে লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে বিদেশমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভি মুরলীধরন জানান, "চীনে দুটি বিশেষ বিমান যাতায়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এয়ার ইন্ডিয়া ৫,৯৮,৯০,৩৫২ টাকার বিল জমা দিয়েছে।" এই বিমান সংস্থা চীন থেকে ৬৪৭ জন ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য মাথাপিছু ৯২,৫৬৬.২৩ টাকা খরচ করেছে। কিন্তু এরজন্য যাত্রীদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নেওয়া হয়নি। এরপরে ইতালি, জাপান এবং ইরানে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনা হয়। সবগুলি ক্ষেত্রেই একই রকম ব্যবস্থা করা হয়, অর্থাৎ যাত্রীদের কাছ থেকে বিমান ভাড়া বাবদ কোনো অর্থ নেওয়া হয়নি। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা ছিল ভারত সরকারের সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে, যেসব পরিযায়ী শ্রমিক নিজ বাসস্থান থেকে বহু দূরে আটকা পড়ে গেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সুবিধাটুকু দিতে কী অসুবিধা হল? গত দুমাস ধরে তালাবন্দি সংক্রান্ত যেসব নিয়মকানুন বলবৎ করা হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, ভারত সরকারের কাছে 'পরিযায়ী শ্রমিক' নামক জনসমুদায় প্রচণ্ড বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, ফলে সংবিধানের ধারা ১৪ মোতাবেক তাঁরা যে সমানাধিকারের দাবিদার, সেটাও খর্ব না করে সরকারের সন্তুষ্টি হচ্ছে না। ভারতের আর্থ -সামাজিক ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা যে অশালীন অসাম্য গেঁথে রয়েছে, তার ফলে সংবিধান প্রদত্ত সমানাধিকারের নিশ্চয়তা রূপায়ণ করতে গিয়ে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, এটা ঠিক। কিন্তু তালাবন্দির সময়ে এই মারাত্মক বিষয়টি এমন অশ্লীলভাবে সামনে এল যে, আমাদের শ্রমিকশ্রেণিকে দেশের সরকার আদৌ নাগরিক হিসাবে ভাবে কি না, সেই ব্যাপারেই ধন্দ লেগে যাচ্ছে।

প্রথমে তো মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে দেশব্যাপী তালাবন্দি ঘোষণা করে সরকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইল। যদি ঐ শ্রমিকদের নাগরিক অধিকার সরকারের চিন্তার পরিধিতে থাকত, তবে তাঁদের জীবন-জীবিকা ও ঘরে ফেরার বিষয় মাথায় রেখে সুন্দর একটা পরিকল্পনা করা যেত এবং তখন এঁদের বৃহদংশ হয়ত নিজের খরচেই ঘরে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের সেই অধিকার সম্পূর্ণভাবে হরণ করে ফেলা হল। শুধু তাই না, ভারতের শ্রমজীবী মানুষের এই বৃহৎ অংশকে সন্দেহের ও অবহেলার চোখে দেখা হল, স্রেফ বিরক্তিকর এক বোঝার মতো আচরণ করা হল তাঁদের সঙ্গে, অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যহীন কপর্দকহীন অসহায় শ্রমিকেরা যখন পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে শুরু করলেন, তখন নির্দয়ভাবে তাঁদের পেটানো হল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অস্থায়ী শিবিরে গাদাগাদি করে তাঁদের রাখা হল, এবং কোথাও কোথাও ক্ষতিকর কীটনাশক দিয়ে স্নান করিয়ে 'জীবাণুশোধন' করানো হল। নাগরিক অধিকার তো দূরের কথা, একজন মানুষ যে সমস্ত মানব অধিকার ভোগ করে, সেগুলোই তাদের দেওয়া হল না। গত ৫ এপ্রিল তারিখের এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সারা দেশে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আটকা পড়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে ১২.৫ লক্ষ শ্রমিককে বিভিন্ন রাজ্য সরকার আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। এই আশ্রয়প্রাপ্ত শ্রমিকের অর্ধেকের বেশি ব্যক্তিই রয়েছেন কেরালাতে। তাহলে সেসব রাজ্যে কোনো আশ্রয় শিবির খোলা হয়নি, কোনো থাকার বন্দোবস্ত করা হয়নি, সেসব রাজ্যে আটকা পড়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কী অবস্থায় রয়েছেন?

উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার সাম্প্রতিক প্রতিবেদন, যেটি "কোভিড -১৯, পরিযায়ীর দৃষ্টি থেকে" নামে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে লিখেছে, "তালাবন্দি, কর্মহীনতা এবং সামাজিক দূরত্বের নিদান— এইসব কিছু একযোগে ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীদের ঘরে ফেরাকে বিশৃঙ্খল ও যন্ত্রণাদায়ক করে তুলেছে।" এই যন্ত্রণাকর পদ্ধতির ফলে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। এই প্রশ্নটা এসেই যায়, যদি পর্যাপ্ত সময় দিয়ে তালাবন্দির ঘোষণা করা হত, তাহলে কি ১২ বছরের একরত্তি মেয়ে জামলো মকদম প্রাণে বেঁচে যেত? এই সেই জামলো মকদম, যে তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, সীমাহীন দারিদ্র্যের কারণে অন্য আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে পাশের রাজ্য তেলেঙ্গানার লঙ্কা খেতে কাজ করতে গিয়েছিল, তালাবন্দি হয়ে যাওয়ায় কাজ ও আশ্রয় হারিয়ে পায়ে হেঁটেই ছত্তিশগড়ে নিজের ঘরে ফিরছিল, কিন্তু অনাহার আর পথশ্রমে কাতর হয়ে মাঝপথেই মারা যায়। তালাবন্দির আগে যদি একটু প্রস্তুতির সময় দেওয়া হত, তাহলে হয়ত সে বাসে চেপে বাড়ি ফিরতে পারত। সেই ক্ষেত্রে সে অন্তত প্রাণে বেঁচে যেত, তাই না? এরকম আরো অনেকেই মারা গেছেন, অনেকেই চরম দুর্দশায় পড়েছেন। এরজন্য দায়ী কে? কে এর উত্তর দেবে ?

এখন তৃতীয় দফার তালাবন্দি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সরকারের প্রহসন অব্যাহত গতিতে চলছে। গত ২৯ এপ্রিল তারিখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে, তাতে বলা হয়, রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে 'সহমতের ভিত্তিতে' বাসের ব্যবস্থা করে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে নেবে। অনুমতি দেওয়া হল, কিন্তু শুধু বাসযাত্রার। কাণ্ডজ্ঞানহীন এই আদেশ জারি করার সময় একবারও ভাবা হল না, পাঞ্জাব থেকে বিহার, অথবা কেরালা থেকে বাংলা পর্যন্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিতে বাসযাত্রার আয়োজন করলে তা কতদিনের বিষয় হবে, বাস্তবসম্মত হবে কি না। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আবারো একবার বোঝা গেল, সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের কোনো অবস্থাতেই নাগরিক অধিকার সম্পন্ন বলে মনে করে না।

২৯ এপ্রিল তারিখের সেই বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদে এগিয়ে এল আটটি রাজ্য। তারা সমস্বরে বলল, এই শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে। দু'দিন পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তার আগের বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করে বলল, 'শ্রমিক স্পেশাল' ট্রেন চালিয়ে এই শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো হবে। তবে এরজন্য শ্রমিকদের পুরো ভাড়া দিতে হবে। এবং শুধু ভাড়াই নয়, তার সঙ্গে 'এক্সপ্রেস চার্জ' এবং খাবারের জন্য আরো ৫০ টাকা করে দিতে হবে!

বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে প্রাথমিক হিসাব তৈরি করেছে, তা অনুযায়ী এক কোটিরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক ঘরে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।

অবশ্য ঘরে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হলে এই সংখ্যা আরো বহুদূর পর্যন্ত বেড়ে যাবারই সম্ভাবনা। গত ২৪ মার্চ তারিখে সংসদে এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রমমন্ত্রক যে হিসেব দিয়েছে, তাতে সারা দেশের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ১০ কোটির মত বলে জানানো হয়েছে। এই শ্রমিকের হাতে যা অল্প বিস্তর টাকা ছিল, তা ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। দুমাস ধরে এঁদের কোনো কাজ নেই। এই শ্রমিকেরা বাইরে কাজ করে নিজ রাজ্যে পরিবারের কাছে টাকা পাঠান, সেই টাকায় পরিবার চলে। যেহেতু কাজ নেই, রোজগার নেই, নিজ রাজ্যে পরিবারও দুর্দশায় পড়ে গেছে। ফলে সেখানেও পরিবারের

সদস্যরা ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছেন, আটকা পড়া রোজগেরে মানুষটার কাছে যে ঘরে ফিরে আসার রেলভাড়া পাঠাবেন, সেই সংস্থানটুকুও নেই।

অন্যদিকে করোনা সংকট মোকাবিলায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'পি এম কেয়ারস' নামে মস্ত বড় এক তহবিল বানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমে খবর আসে— শত শত কোটি টাকা জমা হচ্ছে এই তহবিলে, যদিও সরকারিভাবে এই তহবিলের জমা খরচের কোনো তথ্যই জনসমক্ষে প্রকাশ হয় না। খুব সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে কেন ব্যবহার হবে না এই তহবিলের অর্থ? দেশের সম্পদ যাঁরা নিজের হাতে নির্মাণ করেন, সেই শ্রমিকদের ত্রাণ ও যত্নই যদি উপেক্ষিত থাকে, তবে কাদের ত্রাণের জন্য এই 'পি এম কেয়ারস' তহবিল? চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের 'আহমেদাবাদ-মুম্বাই বুলেট ট্রেন' প্রকল্পের জন্য ৫,৬০০ কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর অনেক কম অর্থে সকল পরিযায়ী শ্রমিকের নিখরচায় ঘরে ফেরা নিশ্চিত করা যায়। তাহলে দেশের স্বার্থ কোথায় বেশি? বুলেট ট্রেন নামক শ্বেতহস্তিসম অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে, নাকি চরম দুর্দশা থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে কয়েক কোটি শ্রমিককে (তাঁরা দেশের নাগরিকও বটে) ঘরে ফেরানোতে?

সকল পরিযায়ী শ্রমিককে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘরে ফেরানোর ক্ষমতা ভারতীয় রেল-এর কাছে রয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে দেশে প্রতিদিন গড়ে ২.৩ কোটি যাত্রী রেলপথে যাতায়াত করেন। এর থেকে যদি দৈনিক যাতায়াত করা যাত্রীদের বাদও দেওয়া হয়, তবুও এটা পরিষ্কার যে, আটকা পড়া শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে মাত্র কয়েক দিনের বেশি লাগার কথা নয়। এরজন্য যেটা দরকার তা হল শ্রমিকদের ঘরে ফেরার অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার রাজনৈতিক সদিচ্ছা। অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে, মহামারির সময়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এবং শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করেই তবে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্য সরকারও এই সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য ছাড়া কীভাবে সবটা করা হবে সেটা অন্য বিষয়। এই ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলিকে 'পি এম কেয়ারস' তহবিল থেকে একটি টাকাও অর্থ সাহায্য করা হয়নি। আর বিপর্যয় মোকাবিলা আইন অনুযায়ী রাজ্যগুলির প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া তো বহু দূরের কথা।

কেন্দ্রীয় সরকার বিপর্যয় মোকাবিলা আইন এবং সংক্রামক রোগ আইন অনুসারে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ জারি করেছে, কিন্তু ১৯৭৯ সালের আন্তর্রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক (কর্মনিযুক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মসংক্রান্ত শর্তাবলি) আইনটিকে বেমালুম চেপে রাখা হয়েছে। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আইনটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই আইনটি শুধুমাত্র সেইসব শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য, যাঁরা অন্য রাজ্যে কাজের জন্য ঠিকাদারদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন, যেসব শ্রমিক কাজের খোঁজে নিজেই রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে যান, তাঁদের জন্য এই আইন প্রযোজ্য নয়। ফলে এই আইনের প্রয়োগপরিধি সীমায়িত, তাছাড়া আইনটি চরিত্রগতভাবেও দুর্বল। এতদসত্ত্বেও এই আইনে শ্রমিকদের জন্য একগুচ্ছ অধিকার স্বীকৃত হয়ে আছে। এরমধ্যে রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে নিবন্ধীকরণ, ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা এবং বর্তমান সময়ে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— কর্মে নিযুক্তির অবসানে নিখরচায় ঘরে ফেরার অধিকার। এখানেই শ্রমিকদের হারানো মজুরি ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নিখরচায় ঘরে ফেরার বন্দোবস্ত করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে একটা আইনগত দাবি উঠে আসে।

ভারতে যে বিশাল সংখ্যায় শ্রমিকবাহিনী রয়েছে, সেটা অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ে আমরা অতি উচ্চমাত্রায় প্রযুক্তিনির্ভর হতে পেরেছি, কিন্তু কঠোর বাস্তব হল এই যে, এই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে সরকারের কাছে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তালাবন্দির অভিজ্ঞতা আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে কীভাবে এই বিশাল সংখ্যক শ্রমিককে যথাযথ নিবন্ধীকরণ করা যায়। পাশাপাশি কীভাবে তাঁদের কর্মনিযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং ভারতের নাগরিক হিসাবে অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানে আরো কঠোর আইন প্রণয়ন করা যায়। এই দিশায় প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার এইসব শ্রমিকদের মর্যাদা সহকারে ঘরে ফিরিয়ে আনা সুনিশ্চিত করুক।

(সৌজন্য ঃ নিউজ পোর্টাল এন ডি টি ভি ডট কম ঃ ৩ মে, ২০২০)